The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 40, December 2025, ISSN 1813-0402

আল মাহমুদের কবিতা : প্রাচ্য নন্দন-ভাবনা

[Al Mahmud's Poetry : Oriental Aesthetic Thoughts]

Dr. Manikul Islam
Professor, Department of Bangla, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh
Most. Airin Khatun
MPhil Researcher, Department of Bangla, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 40, December 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI:
Received : 18 June 2025
Received in revised: 10 March 2026
Accepted: 17 February 2026
Published: 15 April 2026
Keywords: Oriental, Aesthetic, Folk-Sensibility, Tradition, Modernism, Dimension

ABSTRACT

The emergence of Al Mahmud (1936-2019) introduced a powerful and distinct voice in modern Bengali literature. Primarily, he infused the post-fifties poetry with a new dimension in language, theme, and form. A prominent feature of his poetry is the reflection of Oriental aesthetic thought. While Western modernism was busy reshaping Bengali poetry in new forms, Al Mahmud turned his gaze back to the heritage, civilization, culture, and religious beliefs of the East. His collections of poetry vividly express the traditional folk consciousness of Bengal. It is said that Al Mahmud's perspective reveals his sense of identity and deep cultural roots through this aesthetic Oriental vision. As a result, his aesthetic thought provides the inquisitive reader with the opportunity to analyze the traditions of the past in the light of modernity. This article is an attempt to show that Al Mahmud's oriental aesthetic thought has added a new dimension to modern Bengali poetry.

বাংলা কাব্যতিহাসে কবি আল মাহমুদ (১৯৩৬-২০১৯) এর কাব্যভাবনায় প্রাচ্যভুবনের মানুষ, তাদের যাপিত জীবন, প্রতিবেশ, সংস্কৃতি ও আবহমান গ্রামীণ প্রকৃতির যে সৌন্দর্য পরিকীর্ণ তাই মূলত তাঁর কবিতার নির্মাণকলা ও নন্দনবোধের প্রগাঢ় আনুভূমি। সেদিক থেকে বাংলা সাহিত্যের কবিতায় ভিন্ন ঘরানার কাব্যাঙ্গনের ধারক ও বাহক আল মাহমুদ। তিনি প্রকৃতি, নদী, নারী, দেশ, কাল, সমাজ, ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের নানামাত্রিক বাস্তবতাকে এক অনন্য নন্দনবোধে রূপায়িত করেছেন কবিতার মধ্যে। আধুনিক বাংলা কাব্যভুবনে আল মাহমুদের কবিতার বিষয়বৈচিত্র্য নিয়ে সমালোচকের মন্তব্য :

> I think most people would agree with me when I say that Al Mahmud is one of the most important living poets of Bangladesh and that his poetry is unique in many ways.[১]

সেক্ষেত্রে চিরাচরিত গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি, ঐতিহ্য, বাঙালি সংস্কৃতির শৈল্পিকরূপ প্রতিভাত আল মাহমুদের কবিতারাজ্যে। বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) প্রমুখের সাথেই আল মাহমুদ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে প্রজ্জ্বল্যমান। মূলত 'যখন একটা আধুনিক কাব্যভাষার শব্দরাজি ব্যবহৃত হতে হতে জরাজীর্ণ ও দুর্গন্ধময় হয়ে ওঠে তখন এর হাত থেকে কবিদের পরিত্রাণের পন্থা উদ্ভাবন করা উচিত।'[২] এই পথ আবিষ্কারের জন্যই বাংলা আধুনিক কাব্যের ক্ষেত্রে কাব্যের নতুন দুয়ার খুলে দেন আল মাহমুদ । মানব-প্রত্যয়, অভিজ্ঞতা, ধর্ম, দর্শন, আদর্শ এবং বিষয়-বৈচিত্র্যের যে ভূগোল একজন কবির শিল্পিত ভাষ্য বলা যেতে পারে সেটারই উপস্থাপন করেন কবি আল মাহমুদ। পাশাপাশি নন্দনতত্ত্ব বিষয়টি যে আমাদের দৈনন্দিন জীবন-প্রবাহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তারও রূপায়ণ ঘটে আল মাহমুদের কাব্যে। নন্দনতত্ত্বের বিশ্লেষণে সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের মতামত প্রণিধানযোগ্য :

> নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যতত্ত্ব একটি প্রাচীন শাস্ত্র: এর উৎপত্তি শিল্প সৃষ্টির প্রথম তৎপরতার সমসাময়িক। শিল্প মানবমনের আনন্দিত উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ এবং সেই শিল্পীকে সৌন্দর্যের নানান দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় যে শাস্ত্রে, তার নাম নন্দনতত্ত্ব।[৩]

গ্রিক ভাষা থেকে আগত ইংরেজি 'Aesthetics' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নন্দনতত্ত্ব। যার অর্থ 'one who perceive' অর্থাৎ যিনি প্রত্যক্ষণ করেন। অন্যভাবে বললে বলা যায় 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞা'। মূলত 'অনুসন্ধানী মনের কাছে নন্দনতত্ত্ব একটি বিস্ময়, একটি অন্তর্দৃষ্টির অন্য নাম। মানুষ মাত্রই কোনো-না-কোনোভাবে সুন্দরকে উপলব্ধি করে, কিন্তু যদি আমরা নন্দনতত্ত্বের অধ্যয়ন করি, তাহলে আমাদের নান্দনিক বোধ ও অভিজ্ঞতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আরও বহু উপাদানকে গভীর ও বিস্তৃতভাবে অনুধাবন

করতে সক্ষম হবো। নন্দনতত্ত্ব থেকে আমরা এ শিক্ষাই লাভ করি।'[৪] নান্দনিকতার দর্শন নিরপেক্ষ না হলেও এটি স্বাধীন এবং একটি বিমূর্ত সত্তা। রুচি, অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, বিচার, মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নান্দনিকতার রূপ নির্ভর করে। প্রাচীন নন্দনতত্ত্ব গড়ে উঠেছিল প্রাচীন শিল্প, প্রাচীন মিসর, প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, প্রাচীন গ্রিস, প্রাচীন রোম, প্রাচীন সিন্ধু উপত্যকা এবং প্রাচীন চিনের সভ্যতাকে ভিত্তি করে। এখানেই পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্বের পথচলা। হেগেল, বামগার্টেন, শোপেনহাওয়ার, মার্শাল ম্যাকলুহান প্রমুখ তাদের শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে নন্দনতত্ত্বকে প্রকাশ করেন। প্রাচ্য নন্দনতত্ত্ব শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু সুপ্রাচীন কাল থেকেই সাহিত্য নন্দনবিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। এক্ষেত্রে 'কাব্যকে বর্ণসঙ্করশিল্প বলা যেতে পারে। এক অর্থে সঙ্গীতের মতোই তার সুর, তার বিশেষ স্বরগ্রাম, তার নিজেস্ব ধ্বনিবিন্যাসকে আশ্রয় করে ভাষার মাধ্যমে আপনাকে প্রকাশ করে।'[৫] বস্তুত কাব্যের এসমস্ত গুণাগুণ তার সৌন্দর্যময় ভাবসম্পদ। প্রাচীন ভারতীয় কাব্যসাহিত্য ধর্ম, দর্শন তাই একই জীবন-বোধের বিচিত্র বিকাশ। কাব্য সৃজনের ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং একই সঙ্গে তার ভেতর সেই নান্দনিক ভাবনারও উন্মেষ লক্ষ করা যায় বাল্মীকির রচিত প্রথম শ্লোকেও:

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।।
(*রামায়ণ*, বালকাণ্ড, ২/১৫)

বাল্মীকি পরবর্তী ধীরে ধীরে কাব্যের পথযাত্রা অগ্রসর হতে থাকলো। সেখান থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের (৬৫০-১২০০) সর্বপ্রথম নিদর্শন *চর্যাপদেও* (১৯০৭) প্রাচ্য নান্দনিক ভাবনার রূপ নির্ণীত হয়। মূলত চর্যার পদগুলি ওই সময়ের মানুষের জীবন-যাপনের ইতিহাস সংস্কৃতিকে ধারণ করে আসছে। সেখানে পদগুলির মধ্যে পদকর্তাগণ লোকায়ত আবহ ব্যবহার করে শিল্পসৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। যেখানে বাঙালির গ্রাম্য জীবনের দুঃখ-দুর্দশাকে তুলে ধরতেও পদকর্তাগণ নান্দনিকতার আশ্রয় নিয়েছেন:

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।।[৬]

শুধু প্রাচীন সাহিত্যেই নয়; সাহিত্যের অগ্রযাত্রার বৃদ্ধির সাথে সাথে শিল্পী-সাহিত্যিকবর্গের নন্দন-ভাবনার বিষদ বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। মধ্যযুগের (১২০০-১৮০০) সাহিত্য মূলত ছিল দেবদেবী নির্ভর। তখনকার কবিগান, পাঁচালী, টপ্পা, ঠুংরি, মঙ্গলকাব্য, রোমান্টিক প্রণয়োপখ্যান এমনকি অনুবাদ কাব্যসমূহের মধ্যেও এই প্রাচ্য নন্দন-ভাবনা প্রকাশের ঝড় বইতে থাকে। বিশেষত মঙ্গলকাব্যগুলোয় আবহমান গ্রামীণ লোকজ অনুষঙ্গের মধ্যে চিরাচরিত দুঃখ-দুর্দশা প্রকাশ পেতে থাকে। সংসারে স্বামীর পাশাপাশি নারীরা কীভাবে হাটে গিয়ে পসরা দিচ্ছে তা নিম্নরূপ:

নিদয়া বইসে ঘাটে মাংস নিয়া গিয়া হাটে
অনুদিন বেচয়ে ফুল্লরা।
শাশুড়ী যেমন ভণে তেন মত বিচে কিনে
শিরে কাঁধে মাংসের পসরা।।[৭]

ক্রমান্বয়ে ঔপনিবেশিক কালে পশ্চিমা অভিঘাতের যে পরিবর্তন তা প্রাচ্যকেও প্রভাবান্বিত করে। পরবর্তীতে সৃষ্ট আধুনিক যুগের বিদ্রোহী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) লেখাতে প্রাচ্য অনুষঙ্গকে নান্দনিক ভাবনায় ফুটিয়ে তুলতে দেখা যায়। আঙ্গিকে পাশ্চাত্য অনুসরণ করলেও চরিত্র সৃষ্টি করেছেন প্রাচ্য থেকেই। প্রাচীন *রামায়ণ* থেকে চরিত্র নিয়ে আধুনিক ও নিজস্ব নন্দন-ভাবনায় ফুটিয়ে তুলে রচনা করলেন তাঁর *মেঘনাদবধ কাব্য* (১৮৬১)। যেমন:

এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস- ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর—মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিরাকুল, বাঁধা
দৃঢ় বাঁধে।[৮]

সাহিত্যের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের লেখকবর্গের লেখায় প্রাচ্য নান্দনিক অনুষঙ্গের দেখা মেলে। তবে দেখা যায় সেক্ষেত্রে কেউ পাশ্চাত্যের অনুসরণ করে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন কেউ বা প্রাচ্যেই। 'প্রত্যেক মনীষীরই একটি বিশেষ প্রতিভা থাকে—নিজের রাজ্যেই সে সিদ্ধ। কবির সিদ্ধিও তার নিজের জগতে; কাব্যসৃষ্টির ভিতরে।'[৯] ইউরোপীয় সংস্পর্শের ফলে ভারতীয়দের মানসরাজ্যেও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সূচিত হতে থাকে। এই আলোড়ন পুরো সমাজকে তার প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ থেকে আমাদের নিস্তরঙ্গ জীবনপ্রবাহকে আধুনিককালের সমস্যা-সংকুল উত্তালতার মধ্যে এনে ফেলে। কবি আল মাহমুদও এই পরিবর্তনের বাইরে নয়। 'ঔপনিবেশিক সময়কালেও মহৎ শিল্পকর্ম নন্দনতাত্ত্বিক অনুশাসনের সীমা মেনে সৃষ্টি হয়েছে।'[১০] তবে যেখানে পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্বের আগ্রাসী ধারার রূপে শিল্পসাহিত্যও আত্মসমর্পণ করেছে; সেখানে

আল মাহমুদ প্রাচ্য ধারাকে কাজে লাগিয়ে সাহিত্য রচনা করতে থাকে। পারতপক্ষে 'বস্তুজগৎ থেকে অভিজ্ঞতা মারফৎ সংগৃহীত এই উপাদান শিল্পী তাঁর মন, মস্তিষ্ক ও কল্পনার সাহায্যে গ্রহণ-বর্জনের দ্বারা এবং ব্যক্তিত্বের স্পর্শে শিল্পমূর্তিতে সঞ্জীবিত করে তোলে।'[১১] আল মাহমুদও এই পরিমণ্ডলের মধ্যে বসে কাব্যগ্রন্থগুলো রচনা করতে থাকেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির নামকরণের মধ্যেই প্রাচ্য নান্দনিকতার প্রকাশ মেলে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ *লোক লোকান্তর*(১৯৬৩) প্রকাশের মধ্য দিয়েই নান্দনিক কবি হিসেবে আল মাহমুদ পরিচিতি লাভ করেন। এ কাব্যে তিনি লোক হতে লোকান্তরের নানা অনুষঙ্গকে তুলে ধরেছেন। প্রাচ্য ধ্যান-ধারণা থেকে জাগতিক সৌন্দর্য, নদী, নারী, প্রকৃতি, পবিত্র গ্রন্থাদি এবং মূল্যবোধের নান্দনিক প্রকাশ ঘটিয়েছেন এই কাব্যে। আমাদের গ্রামীণ মানুষের অন্যতম গুণ তারা নিজে কারুদক্ষ। বলা যায়, এটি তাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি। তবে আল মাহমুদ তাদের এই গুণকে হেয় প্রতিপন্ন করে নির্বোধ ব্যক্ত করেছেন। কেননা তাদের এই সহজ-সারল্য গ্রাম্য জীবনেও মিথ্যার অলীক ছায়া পড়তে শুরু করেছে। তবুও আল মাহমুদ গ্রামীণ ঐতিহ্যকে একপাশে রেখে লোকজ শব্দ ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন:

মানুষের শিল্প সে তো নির্বোধের নিত্য কারিগরি
রুমালের আঁকা দাগে রঙিন সুতোয় ফুল তোলা,
সাপের অলীক চিত্রে নির্বিষ সাজানো কালো দড়ি,
কাঁদার মূর্তিতে কারো সাধ্যমত আটা পরচুলা।[১২]

এখানে গ্রামীণ মানুষের কারুকাজের দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে; পাশাপাশি আধুনিক জীবনবোধে মেকির ছাপও পরিপ্রেক্ষিত। কাব্যটির নাম কবিতায় কবি গ্রামের লোকালয়ে যে তাঁর যাতায়াত সে প্রসঙ্গকে নিয়ে এসেছেন। বলা যায়, আল মাহমুদের অস্তিত্ব জুড়ে বিরাজমান করেছে গ্রাম-বাংলার চিরায়ত প্রতিচ্ছবি। কবি তাঁর চেতনাকে সাদা সত্যিকারের পাখি বলে তাঁর সরলতা, পবিত্রতা, অনাবিল প্রাকৃতিক সত্যতাকে তুলে এনেছেন। আর এই গ্রামীন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-ঐতিহ্য কবির কাছে এতোটাই মনোমুগ্ধকর মনে হয়েছে যে তিনি এজন্য সমাজ ও সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করতে এবং ধর্মভাবনাকে তুচ্ছজ্ঞান করতেও রাজি। নন্দিত শিল্পলোকের মধ্য দিয়ে কবিতায় তা প্রকাশ করেছেন নিম্নোক্তভাবে:

আমার চেতনা যেন শাদা এক সত্যিকার পাখি
বসে আছে সবুজ অরণ্যে এক চন্দনের ডালে;
মাথার উপরে নিচে বনচারী বাতাসের তালে
দোলে বর্ণ পানলতা, সুগন্ধি পরাগে মাখামাখি
হয়ে আছে ঠোঁট তার।
... ...
মনে হয় কেটে যাবে, ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি
সংসার সমাজ ধর্ম তুচ্ছ হয়ে যাবে লোকালয়।
লোক থেকে লোকান্তরে আমি যেন স্তব্ধ হয়ে শুনি
আহত কবির গান। কবিতার আসন্ন বিজয়।[১৩]

এই কবিতায় কবির লোকালয়ের বর্ণনের সঙ্গে আহসান হাবীবের "আবার আসিব ফিরে" কবিতার কিছুটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতির মধ্য দিয়ে আমাদের সম্মুখে লোকজ জীবনযাত্রাকে তুলে ধরেছেন উভয় কবিদ্বয়। আল মাহমুদ বাঙালি লোকজ সমাজের চিত্র তুলে ধরতে কখনো বেদ, কখনো উপনিষদ, কখনো পুরাণ, কখনো কোরানের আশ্রয়াপূর্ণ হয়েছেন। বিভিন্ন ধর্মের অবতারকে কবিতার মধ্যে তুলে নিয়ে এসেছেন প্রাচ্য চিন্তাধারায়। *লোক লোকান্তর* কাব্যের "নূহের প্রার্থনা" এমনই একটি কবিতা। মহানুভবতা, সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব ছিল নূহ নবীর। তাঁর সময়কালের অবাসযোগ্য পৃথিবীকে তুলনা করেছেন বিশ্বযুদ্ধোত্তর আল মাহমুদ তাঁর সময়ের সঙ্গে। তবে কবি অব্যক্ত, করুণ, মর্মন্তুদ জ্বালা থেকে আশাহত হননি। তাই কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হলো:

পৃথিবীর চিহ্ন নিয়ে যদি ফেরে আশার কপোত
গভীর আদরে আমি তুলে নেবো ফসলের বীজ,
আল্লাহর আক্রোশ থেকে যা এনেছি বাঁচিয়ে যতনে
আবার বুনবো তা-ই পূণ্যসিক্ত নতুন মাটিতে
তোমাকে জড়াবো বুকে হে প্রেয়সী, তোমাকে কেবল
রক্তের উত্তাপ দেবো, প্রেম দেবো, গান দেবো বেঁধে,
তোমাকে ফসল দেবো, গৃহ দেবো, তৃপ্তি দেবো নারী।
আপনাকে শান্তি দেবো আর নূহ, শক্তি দেবো আমি।[১৪]

নূহ নবীর কালের তলিয়ে যাওয়া পৃথিবীকে কবি বাসযোগ্য করার প্রয়াস করেছেন উপর্যুক্ত লাইনগুলোতে। ইসলামের ঐতিহ্যকে সামনে রেখে আধুনিক জীবনচৈতন্যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তিনি। এই কাব্যের "বিষয় দর্পণে আমি", "প্রতিকৃতি", "সমুদ্র নিষাদ", "তিতাস", "কাক ও কোকিল", "অরণ্যে ক্লান্তির দিন", "এমন তৃপ্তির" প্রভৃতি কবিতায় লোকজ ঐতিহ্য ফুটিয়ে তুলেছেন আল মাহমুদ।

মূলত যে সকল কবি 'বাঙালির নৃতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক, ভাষিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত'[১৫] আল মাহমুদও সেই সব কবিদের সঙ্গে নিজেকে সামিল করেছেন। বাংলা কাব্যে জসীম উদ্‌দীন এবং জীবনানন্দ দাশ ঐতিহ্য ও প্রকৃতিমগ্ন কবিতা রচনা করেন। কিন্তু তাঁরা যে প্রকৃতির রূপায়ণ ও বয়ান দেখিয়েছেন তা থেকে প্রকৃতি ও মানুষের পুনর্নির্মাণই আল মাহমুদের *কালের কলস* (১৯৬৬) কাব্যগ্রন্থটি। তিনি লোকজ শব্দকে কীভাবে নান্দনিক রূপ দিয়েছেন তা কাব্যগ্রন্থের নামকরণেই প্রস্ফুটিত। যে কলস গ্রামীণ মানুষের ব্যবহার্য নিত্য দ্রব্যাদি তার মধ্য দিয়ে সময়ের যাত্রাকে বুঝিয়েছেন কবি। সময়ের গতি, প্রকৃতি, চলমানতাকে তুলে ধরতে আধুনিকতার যুগে এসেও আমাদের শিকড়ের মাঝে অনুসন্ধান করতে কবি মূলত কলস শব্দটির ব্যবহার করেছেন। আধুনিকীকরণের মিছিলে গ্রামীণ ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেননি বিধায় তিনি লিখতে পেরেছেন:

আমরা প্রতীকহীন হাতে কোন পতাকা নিইনি।
আমাদের সঙ্গে এক বাউলের বিধবা যাবেন
উষ্ণ বয়সিনী এই বঙ্গ নাম্নী বৈষ্ণবীটি ছাড়া
তৃষ্ণার রাস্তায় আর অন্য কোন যুবতী যাবে না।[১৬]

প্রবহমান সময়েরগর্ভে যেখানে সবকিছু বিলুপ্ত প্রায়; তখন কবি বাঙালির সংস্কৃতিমনার পরিচয় দিতে কবিতার মধ্যে বাউল, বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে নিয়ে এসেছেন। প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকেই আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে এদের ওতপ্রোত সম্পর্ক। তাদের মুখের রচিত লোকগীতি, লোকভাষা কবির অন্তরের অন্তঃস্থলকে স্পর্শ করে। এ বিষয়ে কবির নিজস্ব অভিমত:

আমি লোকভাষা উত্তমরূপে না জানলেও এর ইঙ্গিতময় ভঙ্গি ও রহস্যময় শব্দরাজি আধুনিক বাংলা ভাষার তৈরি করা জমিতে অবলীলায় বুনে দিয়ে মজা দেখতে চেয়েছিলাম। ফল মন্দ হয় নি। তবে চাষগিরি এখন আর ভালো লাগছে না। এখন আমার হাতে শব্দের যে শংকর বীজ জমা হয়েছে তা অন্য উদ্দেশ্যে বলতে চাই। সে ফসলের নাম হোক রহস্যময় বিশ্বাসের শস্য।[১৭]

এই বিশ্বাস হলো ধর্মবিশ্বাস; আর সংস্কারের সঙ্গে আল মাহমুদের যে সম্পর্ক তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিত্য ব্যবহার্য ভাষা ও বাঙালির নিজস্ব ঐতিহ্য। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিও *কালের কলস* কাব্যে বিদ্যমান। কাব্যটির নাম কবিতার মধ্যে কবি তাঁর অন্তরের বাণীকে তুলে ধরতে ব্যবহার করেছেন লোকায়ত প্রাচীন অনুষঙ্গসমূহকে। যুগের ছাপে অস্তিত্বহীনতার ভয়ে কবি বিষণ্ন। এজন্য কবিতার পঙ্‌ক্তির মাঝে অমরত্ব লাভ করতে চেয়েছেন কবিতায়:

এ বিষণ্ন বর্ণনায় আমি কি অন্তত একটি পংক্তিও হবো না
হে নীলিমা, এই অবগুণ্ঠন?
লোকালয় থেকে দূরে, ধোঁয়া অগ্নি মশলার গন্ধ থেকে দূরে
এই দলকলসের ঝোপে আমার কাফন করে আমি কতকাল
কাত হয়ে শুয়ে থেকে দেখে যাব সোনার কলস আর বৃষের বিবাদ?[১৮]

মূলত কবিতাটি আধুনিক নাগরিক জীবনের মর্মন্তুদ, দুঃখ-দুর্দশা ও হাহাকারের প্রকাশ। প্রাচীন কলসের মধ্যে তাঁর জীবনকে টিকিয়ে রাখার তৃষ্ণা কবিতাটিতে পরিলক্ষিত হয়। জীবনানন্দ দাশের মতো কবি আল মাহমুদও 'জীবন থেকে চিরতরে হারিয়ে যেতে চান না, জীবন থেকে পলায়নও করেন না। জীবনকে উপলব্ধি করতে চান গাঢ়ভাবে, পেতে চান অনন্ত সময়ের ক্যানভাসে।'[১৯] এজন্য তিনি এই কাব্যে অনায়াসে নিজস্ব ভাবনার শব্দও প্রয়োগ করেছেন তাঁর মনের উত্তপ্ত, দগ্ধ মনোভাবকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে। কাজী নজরুল ইসলাম যেমন *অগ্নিবীণা* কাব্যগ্রন্থের "বিদ্রোহী", "প্রলয়োল্লাস", "কোরবানী", "ধূমকেতু" প্রভৃতি কবিতায় হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন; তেমনি আল মাহমুদও তাঁর কবিতার মধ্যে মুসলিমদের নানা অনুষঙ্গকে তুলে এনেছেন। ঐতিহ্যের সন্ধানে তাঁর কবিতার বাণীবদ্ধ শব্দাবলি:

আমাকে আসতে হবে অবনত বিনীত নিয়মে
আতরদানীর মতো হয়ে যায় সেখানে হৃদয়
অথবা রেহেলে রাখা অনশ্বর অক্ষরের কাছে
কম্পিত মোমের মতো জ্বালতে চাই আমার আগুন।[২০]

মূলত আধুনিকতার স্পর্শে গ্রামীণ জনজীবন থেকে বেরিয়ে যখন নগরাচ্ছন্ন জীবনযাত্রা দেখে তখন কবির মধ্যে এক ধরনের টানাপোড়েন ও আক্ষেপের সুর বাজতে থাকে। কবি সেখানে থেকে বের হতে পুনরায় নিজের প্রাচ্য ঐতিহ্যে পদার্পণ করে *কালের কলস* নাম দিয়ে কবিতাগুলো আলোচনা করেন। যে কলসের মধ্যে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি বিদ্যমান।

লোক লোকান্তর, *কালের কলস* কাব্যের প্রাচ্য যে নন্দনভাবনার রূপায়ণ তার পরিণত রূপ হলো *সোনালী কাবিন*(১৯৭৩) কাব্যগ্রন্থটি। এখানে তাঁর কবিসত্তার সামগ্রিক বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। নারী, প্রেম, প্রকৃতি, নগর, গ্রাম প্রভৃতির পাশাপাশি চিরাচরিত নানাবিধ লোকায়ত অনুষঙ্গকে কবিতার মধ্যে স্থান দিয়ে কবি আল মাহমুদ তাঁর প্রাচ্য ধ্যান-ধারণার পরিচয় দিয়েছেন। সমালোচকের মন্তব্যে:

> 'সোনালী কাবিন' লৌকিক জীবনের হার্দ্য-করুণ ভূমির ওপর স্থাপিত। এর ভাষায় বাক্যবন্ধে গ্রামীণ জীবনের বিবিধ সৌরভ; বিবাহ- অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ব্রত বা ritual আমাদেরকে আবহমান বাংলার লোক-সংস্কারের স্মৃতির উষ্ণতা দেয়।[২১]

এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা ''প্রকৃতি''র মধ্যে কবি এসকল বিষয়ের আগমন ঘটান। যেখানে কৃষিকাজ ও প্রকৃতির মধ্য দিয়ে নারীকে তুলনা করা হয়েছে। যে নারীর প্রতি কবি নিজেকে সমর্পণ করেছেন; সে নারীকে তুলে ধরতেও আমাদের আবহমান ঐতিহ্যের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। তার বর্ণণ:

> কতদূর এগোলো মানুষ!
> কিন্তু আমি ঘোরলাগা বর্ষণের মাঝে
> আজও উবু হয়ে আছি। ক্ষীরের মতন গাঢ় মাটির নরমে
> কোমল ধানের চারা রুয়ে দিতে গিয়ে
> ভাবলাম, এ-মৃত্তিকা প্রিয়তমা কিষাণী আমার।
> বিলের জমির মতো জলসিক্ত সুখদ লজ্জায়
> যে নারী উদাম করে তা সর্ব উর্বর আধার।[২২]

শুধু তাই নয়, কবি এ কবিতার মধ্যে প্রাচীনতম খনার মন্ত্রের বিশ্বাসকেও স্থান দিয়েছেন। এমনকি "কবিতা এমন" কবিতায় তিনি গ্রামের অনুষঙ্গসমূহকে কবিতার সঙ্গে তুলনা করে কবিতাকে গ্রামের মানুষের জীবনযাপন, তাদের পরিবারের সুখ-দুঃখের কাহিনি, ভাই-বোনের খুঁনসুটি, কোনো সম্বল হারানো গ্রাম্যবধুর অসহায় চিত্র এবং মক্তবে পড়ারত গ্রামের মেয়ে আয়েশা আক্তারের মধ্যে শিল্পিত রূপদান করেছেন:

> কবিতা তো কৈশোরের স্মৃতি। সে তো ভেসে ওঠা ম্লান
> আমার মায়ের মুখ; নিম ডালে বসে থাকা হলুদ পাখিটি
> পাতার আগুন ঘিরে রাতজাগা ছোট ভাই-বোন
> আব্বার ফিরে আসা, সাইকেলের ঘণ্টাধ্বনি—রাবেয়া—রাবেয়া
> আমার মায়ের নামে খুলে যাওয়া দক্ষিণের ভেজানো কপাট!
> ... ...
> কবিতা চরের পাখি, কুড়ানো হাঁসের ডিম, গন্ধভরা ঘাস
> ম্লান মুখ বউটির দড়ি ছেঁড়া হারানো বাছুর
> গোপন চিঠির প্যাডে নীল খামে সাজানো অক্ষর
> কবিতা তো মক্তবের মেয়ে চুলখোলা আয়েশা আক্তার।[২৩]

সমকালীন সমাজকে তুলে ধরতেও এখানে গ্রামীণ শব্দসমূহের ব্যবহার হয়েছে। এ কাব্যের "প্রত্যাবর্তনের লজ্জা" কবিতায় তিনি তৎসময়ের মধ্যবিত্ত মুসলিম জীবনের পাশাপাশি গ্রামীণ সৌন্দর্য ও সারল্যকে নান্দনিকতায় রূপায়িত করেছেন। কবি শাহরিক জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় ভেবে গেলেও দেখে যে সেখানকার মানুষের চেয়ে গ্রামের খেটে-খাওয়া মানুষগুলো গ্রাম্য পরিবেশে বেশি সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধিতে বসবাস করছে। তাই কবি পুনরায় গ্রামে প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছুক:

> কুয়াশার শাদা পর্দা দোলাতে দোলাতে আবার আমি ঘরে ফিরবো।
> শিশিরে আমার পাজামা ভিজে যাবে। চোখের পাতায়
> শীতের বিন্দু জমতে জমতে নির্লজ্জের মতোন হঠাৎ
> লাল সূর্য উঠে আসবে। পরাজিতের মতো আমার মুখের উপর রোদ
> নামলে, সামনে দেখবো পরিচিত নদী। ছড়ানো ছিটানো
> ঘরবাড়ি, গ্রাম। জলার দিকে বকের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। তারপর
> দারুণ ভয়ের মতো ভেসে উঠবে আমাদের আটচালা।
> কলার ছোট বাগান।[২৪]

জীবনানন্দ দাশের "আবার আসিব ফিরে" কবিতার সঙ্গে এই কবিতার গ্রামীণ প্রকৃতির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এর পাশাপাশি ধর্মীয় বিশ্বাসবোধকে তুলে ধরতেও আল মাহমুদ প্রাচ্য নন্দনভাবনার মিশেলে "জাতিস্মর", "শোণিতে

সৌরভে"-এর মতো কবিতা রচনা করেছেন। যেখানে ইভের প্রসঙ্গ দেখা যায় কবিতার মধ্যে; যেমন, 'ঈভের মতো আজ হাওয়া চঞ্চল।'[২৫] কাব্যের নাম কবিতা "সোনালী কাবিন"-এর মধ্যে যে ১৪ টি সনেট রচিত হয়েছে তার প্রতিটি অংশতেই কবির প্রাচ্যীয় নন্দনভাবনার অঢেল মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। কখনো আবহমান মুসলিম সমাজের সংস্কৃতি, কখনো সৌন্দর্য, কখনো কৌম সমাজ, কখনো সাম্যবাদ, কখনো সমাজের যৌনতা তুলতে বাঙালির লোকায়ত জীবনযাপন পদ্ধতি নিয়ে এসেছেন। মুসলমানদের বিয়ের কাবিনের যে সংস্কৃতি তা দিয়ে কবিতার সূচনা। পাশাপাশি বাঙালির দারিদ্র্য-জীর্ণ-দীর্ণ অবস্থাও পরিপ্রেক্ষিত। সেজন্য কাবিন হিসেবে খেটে-খাওয়া এই হাত দুটি শুধু দিতে রাজি তিনি:

সোনার দিনার নেই, দেনমোহর চেয়ো না হরিণী
যদি নাও, দিতে পারি কাবিনবিহীন হাত দু'টি, [২৬]

এই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সনেট ২-এর মধ্যে বাঙ্গালীদের ইতিহাস, ঐতিহ্যের কৌম সমাজ, বাৎস্যায়ন, আর্যের যুবতী প্রভৃতিকে নান্দনিকতার ভাষ্যে তুলে ধরতে প্রয়াস করেছেন আল মাহমুদ। ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিভিন্ন বিষয়কে নান্দনিক রূপ দিতে কবি আবহমান বাঙলার সংস্কৃতির দ্বারস্থ হয়েছেন। যেখানে রোসাঙ্গ রাজসভার কবি আলাওলকে নিয়ে এসেছেন। আবার সকল ধর্মের ঊর্ধ্বে যে মানুষকে স্থান দিয়েছেন সেই উদারচিত্ত লালনকে তুলে এনেছেন। তার প্রকাশ এই সনেটগুচ্ছের ৬ নম্বর কবিতায়:

মুখ ঢাকে আলাওল-রোসাঙ্গের অশ্বের সোয়ার।
এর চেয়ে ভালো নয় হয়ে যাওয়া দরিদ্র বাউল?
আরশি নগরে খোঁজা বাস করে পড়শী যে জন
আমার মাথায় আজ চূড়ো করে বেঁধে দাও চুল
তুমি হও একতারা, আমি এক তরুণ লালন,
অবাঞ্ছিত ভক্তিরসে এ যাবৎ করেছি যে ভুল
সব শুদ্ধ করে নিয়ে তুলি নব্য কথার কূজন।[২৭]

আল মাহমুদ কবিতা লিখলেও 'পাকিস্তান আমলে বোধহয় তিনি সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না।'[২৮] তবে পরবর্তীতে এই কাব্য প্রকাশের পর তিনি সার্থকতা লাভ করেন সাহিত্যসমাজে। 'লোকায়ত প্রাণস্পন্দনের প্রতীকীরূপ আল মাহমুদের কবিতা। গ্রামীণ ও লোকজ-ঋতুজ উপাদানকে আধুনিক মাত্রায় অভিষিক্ত করেন তিনি।'[২৯] এমন নান্দনিকতায় ভাস্বর *মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো* কাব্যগ্রন্থটি। তবে আল মাহমুদের প্রথম তিনটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে প্রাচ্য নন্দন-ভাবনা যেভাবে পরিলক্ষিত হয় আস্তে আস্তে তা ক্ষীণ হতে থাকে। এ কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য, 'এ গ্রন্থের মাধ্যমে তার পুরনো বৃত্ত ছেড়ে খানিকটা বেরিয়ে এসেছেন বা বলা যেতে পারে, এরপর থেকে হয়তো আল মাহমুদের কবিতা নতুন পথে বাঁক নিবে।'[৩০] তবুও কাব্যগ্রন্থের শুরুর দিকের কবিতায় বাঙালির ঐতিহ্যমনা মনের পরিচয় দেন স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্য দিয়ে:

তবে কি আমি ভুল করে
রাতের অন্ধকারে অবলুপ্ত নগরী মহাস্থানগড়ের অভ্যন্তরে চলে এসেছি?
ঝিঁঝির চিৎকারে আমার কান ঝালাপালা,
ভয় আর শীতে আমি কাঁপছি। জোনাক পোকার আলো
বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির মতো আমার চুল, আমার মুখ আর বুকের ওপর
স্পর্শ রাখছে।[৩১]

কবি আবহমান বাংলার পথ চলতে চলতে মহাস্থানগড়ের স্থাপত্যের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। যেখানে তিনি প্রকৃতির স্পর্শ অনুভব করছেন। কাব্যটির নাম কবিতা "মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো"র মধ্যে ধর্মীয় ইতিহাস, ঐতিহ্যকে স্থাপন করেছেন কবি। যেখানে তিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রূপ নিয়েছেন। এছাড়াও "কৃষ্ণকীর্তন" কবিতায় হিন্দু ধর্মের বিশ্বাসকেও নান্দনিক মাত্রা দান করে নিজের লোকায়ত মানসভাবনার পরিচয় দিয়েছেন আল মাহমুদ। অলৌকিকতায় আচ্ছন্ন কবি বিশ্বাস স্থাপনে দৃঢ় সংকল্প:

বিশ্বাসে মিলায়ে কৃষ্ণ তর্কে শুধু বেজে ওঠে বাঁশি,
দু'কানে আঙুল রেখে দাঁড়াবো কি কদম্বের মূলে?[৩২]

রাধা-কৃষ্ণের যমুনা তীরবর্তী প্রেমকে তুলতেই তাদের ধর্মের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে তুলে এনেছেন। আধুনিক যুগে যেখানে মানুষের উপর বিশ্বাস রাখা যায় না সেখানে কবি পৌরাণিক চরিত্র কৃষ্ণের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করার কথা ব্যক্ত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাঙালির জীবনযাপনের পরিবর্তনের ঢেউ বইতে থাকে। এই সময় আল মাহমুদ আপন কাব্যগুণে বাঙালি নানান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মিশেল দিয়ে রচনা করেছেন *অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না*। বিশেষত মুসলিম ঐতিহ্যকে নান্দনিকতায় ভাস্বর করে উপস্থাপন করা হয়েছে এ কাব্যমধ্যে। *বখতিয়ারের ঘোড়া* কাব্যে কবি তাঁর ধর্মবিশ্বাসজাত যে দর্শন তার চরমে পৌঁছে যান এবং নিজেকে মুসলমান হিসেবে নানান অনুভাবনার মধ্য দিয়ে প্রাচ্য মুসলমানের ইতিহাস-

ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে রূপদান করেছেন। পাশাপাশি "বখতিয়ারের ঘোড়া" নাম কবিতায় বখতিয়ার খলজি, "নীল মসজিদের ইমাম" কবিতায় ইবলিশ, শয়তান, মসজিদ-মিনারকে তুলে আনেন। তবে যে শুধু মুসলিম অনুষঙ্গ এনেছেন তা নয়; এ কাব্যের "সনেট: ৩" কবিতায় বেদেনীর গান, "ভারতবর্ষ" কবিতায় ক্ষত্রিয়, শাক্য, ইন্দ্র, গৌতম প্রমুখের কথা নিয়ে এসেছেন। বাস্তব জগৎ ও জীবনের চলমান সময়, সমাজ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য চিত্রায়ণে কবিরা যেমন সিদ্ধহস্ত; তেমনি ব্যক্তির অবচেতন মননের গহীন অরণ্যে গভীর জীবনবোধ অন্বেষণেও তাঁরা দেখিয়েছেন বিচিত্র পথ। যে পথ কখনো নিয়ে গেছে প্রাচীন ঐতিহ্যের সন্নিকটে, আবার কখনো বা নিকট ভবিষ্যতের প্রান্তে। এমন পথ-পরিক্রমা অতিক্রম করেই কবি আল মাহমুদ *আরব্য রজনীর রাজহাঁস* কাব্যটি রচনা করেছেন। 'সত্যিকারের কবিরা বুদ্ধিভিত্তিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে নয়, বরং তাদের কাব্যময়তা দ্বারা স্বীকৃত হন।'[৩৩] আল মাহমুদ এ কাব্যে আরব্য রজনীর মিথ, কেচ্ছা-কাহিনিকে আপন নান্দনিক ভাবনায় তুলে ধরেছেন। মূলত যুদ্ধোত্তর মানুষের অস্তিত্বের সংকটকে প্রতীকায়িত করে উপস্থাপন করেছেন:

আমি বলি, হে আরব্যরজনীর রাজহাঁস
তুমি কেন পৃথিবীর পাশব শিকারীদের মধ্যে নেমে এলে?
তোমার ডানায় বেহেস্তের গন্ধ। তোমার মাংসে
লবণপর্বতের হাওয়ার আস্বাদ। হায় হতভাগ্য পাখি
তুমি কেন নতুন নগরপ্রান্তের জলাশয়গুলোতে বিহার করতে চাও?
নাকি তুমি তাক করা বন্দুকের নল চিনতে পারো না?
তোমার রানের স্বাদ নিতে উন্মত্ত জিহ্বাগুলোকে চিনতে পারো না কি তুমি?[৩৪]

এখানে যুদ্ধ বিধ্বস্ত পৃথিবীতে ইঙ্গিত করেছেন। হাঁসটি অসহায় মানুষের প্রতীকরূপ। যাদেরকে শোষণ করতে মানুষ ব্যস্ত। ভোগবাদী মানসিকতাকে তুলে ধরেছেন রূপকের আড়ালে। নন্দনতত্ত্ব হলো এক ধরনের জীবনপরিশীলনের অভিজ্ঞতা, 'এক ধরনের নান্দনিক মনোভাব, এক ধরনের নান্দনিক গুণ, এক ধরনের নান্দনিক মূল্য এবং এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত কিছু বিষয়, যেমন: শৈল্পিক সৃজনশীলতা, শৈল্পিক আদর্শ, সৌন্দর্য ও এর বিপরীত বিষয় সংক্রান্ত অধ্যয়ন। যখন কেউ তার অভিজ্ঞতার গুণে নিজেকে উন্মুক্ত করে তখন সে কোনো শিল্পকর্ম বা প্রকৃতির এক টুকরা অংশের মধ্যে নান্দনিক মনোভাব গ্রহণ করে।'[৩৫] আল মাহমুদের পরবর্তী কাব্যগুলোর মধ্যে প্রাচ্য ভাবনা নান্দনিক রূপলাভ করেছে এমন শিল্পস্বরূপের মধ্য দিয়ে। কখনো আবহমান বাঙালির ঐতিহ্যে, কখনো সংস্কৃতিতে, কখনো ইতিহাসে। *প্রহরান্তের পাশফেরা* (১৯৮৮) কাব্যের "প্রহরান্তের পাশফেরা", "ইকবাল", "ইউসুফের উত্তর" আবার *একচক্ষু হরিণ* (১৯৮৯) কাব্যের "মীনার প্রান্তরে", "ইয়াসিন আরাফাত'', "আধুনিক কবিতা"-দ্বয়ে দেখা যায় অঢেল শিল্পসৌন্দর্য। *আমি দুরগামী* (১৯৯৪) কাব্যের "মায়াবী সালুন" কবিতায় এই বাঙলার চিরায়ত অনুষঙ্গ আরো উজ্জ্বল:

আমি তোমার দিকে এক সরল গ্রাম্য কিষাণের মত চেয়ে থাকি
কারণ আমি ভূমিহীনদের দুঃখ জানি। আসলে আমি
মেঘনাপাড়ের রাইসরিষার এক অদ্ভুত ভূমিখণ্ডের ওপর
হাল চালিয়ে একশো রকম বীজ বুনি। অকালে উষর হলে
আমি কি পারি আমার আদিম মাটিকে ছেড়ে যেতে?[৩৬]

শুধু কবিতার অনুষঙ্গে ও শিল্পে যে তিনি প্রাচ্য নন্দন-ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন তা নয়; ছন্দের ক্ষেত্রেও তাঁর নিজস্ব ধারার কাব্যের আবেদন অক্ষুণ্ন রাখতে নিজস্ব ধারার ছন্দরীতি ব্যবহার করেছেন। 'কবিতার ছন্দই হলো তার বিশেষ সম্মোহনে শক্তি।'[৩৭] ঠিক এভাবেই আল মাহমুদও তাঁর নিজস্ব লোকায়ত আঙ্গিকে ছন্দের আনয়ন করেন।

মানুষের অন্তর্লীন আনন্দ-বেদনা প্রকাশের মাধ্যম কবিতা। আর সেখানে সৃজনশীল ব্যক্তিমাত্রই পূর্ববর্তী ধারা ও বোধকে আত্মস্থ করে গঠন করেন তাঁর নিজস্ব পথপরিক্রমা। বাংলা আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে আল মাহমুদ যে প্রাচ্যের অনুসারী ছিলেন উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করলে তা বোঝা যায়। পাশ্চাত্য কবি 'সান্তায়ানা যথার্থই বলেছেন যে কবি হলেন মূলতঃ কথার স্বর্ণকার; কথার সোনা দিয়ে তিনি কাব্যের অলংকার গড়েন। শব্দের যে ইন্দ্রিয়জ আবেদন কবিকে আকর্ষণ করে কবি তাঁর পাঠককে সে শব্দের আমন্ত্রণটুকু পাঠান।'[৩৮] এজন্য আল মাহমুদও তাঁর কাব্যভাষা গড়তে আবহমান গ্রাম-বাংলার চিরায়ত সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাসের সঙ্গে প্রাচ্য নন্দন-ভাবনার মিশেল ঘটিয়েছেন। নন্দনভাবনা এমন একটি বিষয় যার 'দক্ষতা না থাকলে আমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ সৌন্দর্যবোধের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হতো।'[৩৯] এই পথ অনুসরণ করে আল মাহমুদ নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে জীবন ও শিল্পের সম্পর্ককে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে তুলেছেন। যেখানে এই প্রাচ্য নন্দনভাবনা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতুরূপে কাজ করছে। 'ইতিহাস-ঐতিহ্যের বিশাল জগতে পরিভ্রমণ করে কবি আবহমান কাল ও সমাজ-সভ্যতার সঙ্গে নিজস্ব কাব্যধারাকে আপন শৈলীতে সংযুক্ত'[৪০] করেছেন বলেই তিনি আজও বাংলা সাহিত্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রজ্জ্বল্যমান।

তথ্যনির্দেশ

১ Kabir Chowdhury, *Selected poems: Al Mahmud* (Dhaka: Bangla Academy, 1981), p. iii
২ আল মাহমুদ, *কবির কররেখা* (ঢাকা: সূচীপত্র, ২০০৮), পৃ. ১৬
৩ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, *নন্দনতত্ত্ব* (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৫), পৃ. ১১
৪ Harold H. Titus, *Living Issues in Philosophy* (New Delhi: Eurasia Publishing House P.Ltd., 1968), p. 370
৫ সুধীর কুমার নন্দী, *নন্দনতত্ত্ব* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৬), পৃ. ৮৫
৬ অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ* (কলকাতা: নয়া প্রকাশ, ১৩৬৭), পৃ. ৬১
৭ সুকুমার সেন (সম্পা.), *কবিকঙ্কন মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল* (নয়া দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি, ১৩৮২), পৃ. ২০৮
৮ মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *মেঘনাদবধ কাব্য* (কলকাতা: স্বর্ণা প্রেস, ১৩২২), পৃ. ১৪
৯ জীবনানন্দ দাশ, *কবিতার কথা*, (ঢাকা: বিভাশ, ২০১৮), পৃ. ১২
১০ হীরা সোবাহান (সম্পা.), *ষান্মাসিক শিল্পকথা শিল্প- সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা* (রাজশাহী: প্রকৃতি-প্রত্যয় প্রকাশন, ২০২১), পৃ. ১৯
১১ বিমল মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্য বিবেক* (কলকাতা: গ্রন্থমেলা, ১৩৬৬), পৃ. ২৩
১২ আল মাহমুদ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী, ২০২৩), পৃ. ১৮
১৩ তদেব, পৃ. ২৩
১৪ তদেব, পৃ. ২৭
১৫ ফজলুল হক তুহিন, *আল মাহমুদের কবিতা বিষয় ও শিল্পরূপ* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৪), পৃ. ২৫৮
১৬ আল মাহমুদ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
১৭ সাজ্জাদ বিপ্লব (সম্পা.), *মাহবুব হাসান কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার* (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০০৩), পৃ. ৮১
১৮ আল মাহমুদ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
১৯ মানিকুল ইসলাম, *আধুনিক বাংলা কাব্যে দুঃখবাদী চেতনা* (ঢাকা: সূচয়নী পাবলিশার্স, ২০০৪), পৃ. ১৪৭
২০ আল মাহমুদ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
২১ আল মাহমুদ, *সোনালী কাবিন* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্যসম্ভার, ২০১৮), পৃ. ৬৭
২২ আল মাহমুদ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
২৩ তদেব, পৃ. ৫৩-৫৪
২৪ তদেব, পৃ. ৫৬
২৫ আল মাহমুদ, *সোনালী কাবিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
২৬ আল মাহমুদ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
২৭ তদেব, পৃ. ৬৭
২৮ জুলফিকার মতিন, *বাংলাদেশের সাহিত্যে বিনাশী সময় অবিনাশী কাল* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১), পৃ. ৫৬
২৯ শহীদ ইকবাল, *বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস ১৯৪৭ থেকে ২০০০* (ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ. ১৫৭
৩০ আলোচককের নামবিহীন, "আল মাহমুদের সাম্প্রতিক গ্রন্থ" *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৯৭৬; উদ্ধৃত: সাজ্জাদ বিপ্লব (সম্পা.), *স্বল্পদৈর্ঘ্য*, সংখ্যা ৭, (বগুড়া: ২০০০), পৃ. ১১০
৩১ আল মাহমুদ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
৩২ তদেব, পৃ. ১০৮
৩৩ মূল। ক্যাথারিন এভারেট গিলবার্ট হেলমুট কুন; অনুবাদ। শফিকুল ইসলাম, *দি হিস্ট্রি অব এস্থেটিকস*- গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ *নন্দনতত্ত্বের ইতিহাস* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০২২), পৃ. ২০৭
৩৪ আল মাহমুদ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭
৩৫ L. James Jerrett, *The Quest for Beauty* (Engleenwood Cliffs: Prentice-Hall, 1957), p.106
৩৬ আল মাহমুদ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫
৩৭ সুধীর কুমার নন্দী, *নন্দনতত্ত্ব* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৭৯), পৃ. ১২২
৩৮ তদেব, পৃ. ১২১
৩৯ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, *সৌন্দর্যতত্ত্ব* (কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭), পৃ. ৪
৪০ ফজলুল হক তুহিন, *আল মাহমুদের কবিতা বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯